বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন
(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

BEN Bangladesh Environment Network

বাপা-বেন বার্ষিক সম্মেলন -২০২২
BAPA-BEN Annual Conference 2022
জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন
Energy, Climate Change and Sustainable Development

বাপা-বেন আয়োজিত

২০২২ সনের ১১-১২ ফেব্রুয়ারিতে

"জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন, ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন"

বিষয়ক বিশেষ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

Resolution Adopted by

BAPA-BEN Annual Conference 2022

Energy, Climate Change, and Sustainable Development

11 -12 February, 2022

Stamford University Bangladesh
51 Siddheswari Road (Ramna), Dhaka-1217
And
Zoom Room(s)

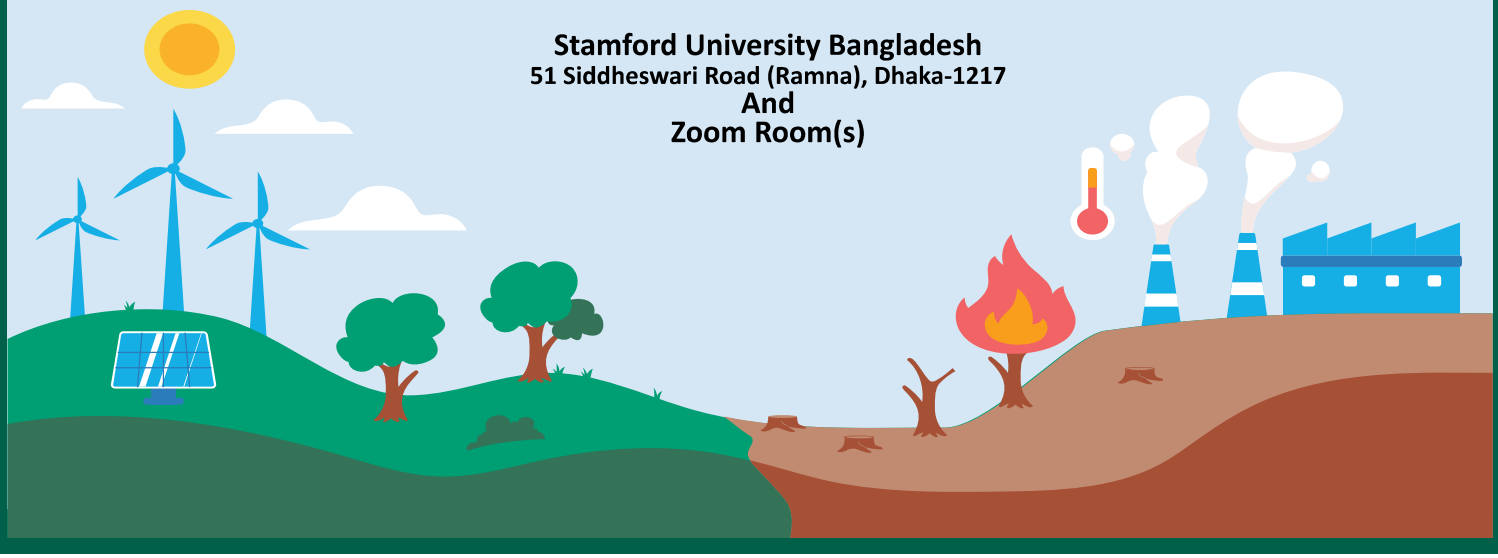

২০২২ সনের ১১-১২ ফেব্রুয়ারিতে
বাপা-বেন আয়োজিত
“জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন, ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন”
বিষয়ক বিশেষ সম্মেলনে গৃহীত

প্রস্তাব

মুখবন্ধ

বাপা এবং বেনের ঐতিহ্য অনুযায়ী ২০২২ সনের ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অবস্থিত স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে হাইব্রিড পদ্ধতিতে “জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন, ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন” বিষয়ক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন স্থান এবং বিদেশ থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বহুসংখ্যক প্রতিনিধি অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একদিকে ছিলেন পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যদিকে ছিলেন বাপার বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ এবং পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণ। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি রেহমান সোবহান। এছাড়া সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন পরিবেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) চেয়ারম্যান বিদ্যুৎ বিভাগে সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এবং অন্যান্য সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের একটি বিশেষ অধিবেশনে জ্বালানী বিষয়ে নিজ নিজ দলের অবস্থান ব্যক্ত করেন। দেশের বুদ্ধিজীবি মহলের অনেক বিশিষ্ট সদস্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

এই সম্মেলনে প্রায় ৬০টির মতো প্রবন্ধ বিভিন্ন সম্মিলিত এবং সমান্তরাল বিশেষজ্ঞ অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। এসব প্রবন্ধে জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তথ্য-উপাত্ত এবং গবেষণা ভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হয়। এছাড়া এই সম্মেলনে একাধিক সম্মিলিত এবং সমান্তরাল সাধারণ অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বাপার নেতা ও কর্মীগণ নিজ নিজ এলাকার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের ঘোষণা এবং প্রবন্ধ আমন্ত্রণ অনুযায়ী এই সম্মেলন নিম্নরূপ ইস্যুসমূহের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে। এগুলো হলো:

(ক) চাহিদার সাথে সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধান;
(খ) নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বাড়ানো ও উপযুক্ত, কার্যকর ও ফলপ্রসূ জ্বালানী মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ;
(গ) রাষ্ট্রীয় ও ব্যাক্তিখাতের ভূমিকার সঠিক সমন্বয়;
(ঘ) দেশীয় এবং বৈদেশিক সংস্থা এবং প্রভাবের সঠিক সমন্বয়;
(ঙ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বোত্তম আকার নিশ্চিতকরণ;
(চ) বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন স্থাপনা্র সঠিক ভৌগলিক অবস্থান নিশ্চিতকরণ;
(ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উপযোগী বিতরণ এবং সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণ;
(জ) জ্বালানী কৌশলের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;
(ঝ) জ্বালানী কৌশলের পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা এবং জ্বালানী, পানি, খাদ্য/ফসল ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভারসাম্য রক্ষা
(ঞ) জ্বালানী কৌশলের ঝুঁকি সহনশীল পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা;

(ট) সনাতনী জ্বালানী বিষয়ে সঠিক কৌশল অবলম্বন;

(ঠ) নবায়নযোগ্য জ্বালানীর পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(ড) জ্বালানী এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈদেশিক নির্ভরতা পরিহার করে জাতীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে প্রণয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

সম্মেলনে জ্বালানীর বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত দেশের বিভিন্ন স্থানের নদনদী, পরিবেশ, এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের অভিজ্ঞতা আলোচিত এবং তাঁর ভিত্তিতে সুপারিশ উপস্থাপিত হয়। সেকারণে এই প্রস্তাব দুই অংশ বিভক্ত। প্রথম অংশে জ্বালানী বিষয়ক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশসমূহ উপরে উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী পরিবেশিত হয়েছে। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের অন্যান্য ইস্যু সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, সুপারিশ, এবং দাবী পরিবেশিত হয়েছে।

প্রথম অংশ
জ্বালানী বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশসমূহ

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিগত সময়কালে, বিশেষতঃ ২০০৮ সনের পর থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতিজনিত সংকট দূরীভূত হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য সম্মেলন এসময়কালের সরকার, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করছে।

সম্মেলন মনে করে যে, বিদ্যুতের অভাব মোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জ্বালানী খাত এক নতুন পর্বে উপনীত হয়েছে। এই নতুন পর্বে আবার উদ্ভূত হয়েছে নতুন প্রজন্মের সমস্যা, ইস্যু, এবং চ্যালেঞ্জ। অনেক ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেসব নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলিই এসব সমস্যা, ইস্যু, এবং চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে।

তদুপরি বাংলাদেশ সরকার সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের কাঠামোগত (ফ্রেমওয়ার্ক) কনভেনশনের [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)]-র আওতায় অনুষ্ঠিত কপ-২৬ (COP-26) সম্মেলনে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং হালনাগাদ করা "জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান" [Nationally Determined Contributions (NDC)] জমা দিয়েছে । বাংলাদেশ সরকার "মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা" [Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP)] -র মাধ্যমে এই অবদান নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সনের মধ্যে ৩০% এবং ২০৪০ সনের মধ্যে ৪০% জ্বালানী নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাত থেকে আহরণের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে এই অনুপাত ৩% এর চেয়েও কম। নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংক্রান্ত এই লক্ষ্য অর্জন বর্তমানে বাংলাদেশকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে।

সম্মেলন মনে করে যে, উপর্যুক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের বর্তমানের খণ্ডিত অবস্থার পরিবর্তে সার্বিক সমন্বিত কৌশল গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং সে উদ্দেশ্যে বাঞ্ছিত জাতীয় সক্ষমতা গড়ে তোলা আবশ্যক। এই উপলব্ধি থেকে সম্মেলন নিম্নরূপ পরিলক্ষণ এবং সুপারিশসমূহ উত্থাপন করছে।

(ক) চাহিদার সাথে সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধান

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকদের মতে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার বেশী অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। এই অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে সরকারকে এখন বিপুল পরিমাণ অর্থ (বাৎসরিক প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা, যা ২০২০-২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট এর প্রায় ১.৭৫%) ব্যয় করতে হচ্ছে যা সরকারের অন্যান্য উন্নয়নশীল খাতে ব্যবহার করা যেত । এর ফলে জনগনের টাকার অপচয় হচ্ছে এবং তা সরকারের বাজেটের উপর অনভিপ্রেত চাপের সৃষ্টি করছে । সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, যদিও বাংলাদেশের জন্য টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানি কর্তৃক ২০১৬ সনে প্রণীত এবং ২০১৮ সনে পরিনিরীক্ষিত "পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান" (PSMP) অনুযায়ী একটি দেশের "রিজার্ভ মার্জিন" ১০-২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এই পরিকল্পনাই আবার বাংলাদেশের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং চাহিদার এমন প্রক্ষেপণ প্রস্তাব করে যে, তাতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ মার্জিন ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কিংবা তার বেশী নির্ণীত হয়। কেন PSMP (2016/2018) এত বিপুল পরিমাণে রিজার্ভ মার্জিন সহকারে একটি বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, তা পরিষ্কার নয়। তবে এটা পরিষ্কার, যে এত বিপুল রিজার্ভ মার্জিন বাঞ্ছনীয় নয়।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির আলোকে সম্মেলন সরকারকে রিজার্ভ মার্জিন দ্রুত কমিয়ে আনার এবং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ অস্বাভাবিক হারের রিজার্ভ মার্জিনের উদ্ভব না ঘটে সে লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। সম্মেলন মনে করে যে, সে লক্ষ্যে সেযব পদক্ষেপ সরকার বিবেচনা করতে পারে সেগুলো হলো:

(ক) শিল্পায়নের চরিত্রকে আরও ব্যাপক করা;
(খ) আরও বেশী মানুষের কাছে বিদ্যুতের সরবরাহ পৌঁছানো;
(গ) প্রতিবেশী দেশসমূহের নিকট বিদ্যুৎ রপ্তানি;
(ঘ) অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকা;
(ঙ) ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়ের গ্যারান্টি প্রদান থেকে বিরত থাকা;
(চ) নতুন পরিস্থিতির আলোকে এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে নিরন্তর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে, রিজার্ভ মার্জিন ১৫ থেকে ২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রেখে বিদ্যুৎ বিকাশের নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(খ) নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বাড়ানো ও উপযুক্ত, কার্যকর ও ফলপ্রসূ জ্বালানী মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিগত সময়কালে বাংলাদেশ জ্বালানী মিশ্রণের ক্ষেত্রে কয়লার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এমনকি এক পর্যায়ে জ্বালানী মিশ্রণে কয়লার ভূমিকা ৭০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছিলো। তারই প্রতিফলন হিসেবে ২০১৭ সন নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সকল নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ভূমিকা মাত্র ৩৩০ মেগাওয়াটে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে (যা কিনা মোট উৎপাদনের মাত্র ৩ শতাংশের চেয়েও কম)।

সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, বাপা ও বেন প্রথম থেকেই কয়লার প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিরোধিতা করেছে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানীর প্রতি আরও মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, সরকারী সংস্থাসমূহ তখন বাপা-বেনের এসব সুপারিশের প্রতি কর্ণপাত করেনি।

তবে সম্মেলন লক্ষ করে যে, ২০২১ সনে জাতিসংঘের ২৬তম কপ (COP-26) সম্মেলনের প্রাক্কালে সরকার কয়লা থেকে কিছুটা সরে আসার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। সে উদ্দেশ্যে অনেকগুলো কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প পুরোপুরি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং

অনেকগুলি বিদ্যুৎ প্রকল্পকে কয়লার পরিবর্তে গ্যাসে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকার ২০৪১ সনের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভূমিকা ৪০ শতাংশে বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ও পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং বর্জ্য ও বায়োমাস থেকে শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে।

সম্মেলন এসব ঘোষণা এবং সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়, তবে সম্মেলন লক্ষ্য করে যে, সরকার রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে নাই; এবং এটাকে কয়লা থেকে গ্যাসে রূপান্তরের প্রস্তাবও করে নাই। সম্মেলন এ বিষয়ে জোরালো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে এবং রামপাল প্রকল্প বাতিল করার দাবী পুনর্ব্যক্ত করছে।

পাশাপাশি সম্মেলন বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ভূমিকা ২০৪১ সন নাগাদ ৪০ শতাংশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। সম্মেলন আশংকা করে যে, বিশেষ প্রচেষ্টার অনুপস্থিতে এই লক্ষ্য অনার্জিত থেকে যেতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানীকে যদি জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের উচিত কৃষি খাত, আবাসন খাত এবং আরো অন্যান্য খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (Bangladesh National Building Code)-এর মাধ্যমে আবাসন খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। MCPP-এর "4GW মুজিব বঙ্গোপসাগর ইনডিপেনডেন্স গিগা এরে" (Mujib Bongoposagar Independence Giga Array)-র মত বায়ু শক্তি ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংক্রান্ত বড় প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই করার সময় অবশ্যই ভালোভাবে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment) এবং জীবনচক্রব্যাপী স্থায়িত্বশীলতা নিরূপন (Life Cycle Sustainability Assessment) করা জরুরী। সম্মেলন লক্ষ করে যে, জ্বালানী মিশ্রণের সাথে আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতার ইস্যু ঘনিষ্টভাবে জড়িত। সে কারণে এই ইস্যু আরও গভীর মনোযোগের দাবী করে।

সমন্বিত জ্বালানী মহাপরিকল্পনায় (Integrated Energy and Power Master Plan) বিভিন্ন ধরণের নবায়নযোগ্য জ্বালানীর (যেমন ছাদে ব্যবহৃত সৌরবিদ্যুত প্যানেল, সৌরতাপ বিদ্যুৎ, বায়ূ বিদ্যুৎ, ঢেউ বিদ্যুৎ, জোয়ার-ভাটা বিদ্যুৎ, ছোট-মাঝারী আকারের জল-বিদ্যুৎ, সমূদ্র-তাপ বিদ্যুৎ, হাইড্রোজেন শক্তি, ইত্যাদি) সর্বোচ্চ পরিমাণে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে সব ধরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানী দ্বারা উৎপাদিত শক্তি মজুদ করা এবং সর্বোচ্চ চাহিদার সময় তার ব্যবহার অথবা বিদেশে রপ্তানির পরিকল্পনা এখন থেকেই নিতে হবে। সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, ২০৪০ সালের ভিতরে ৪০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানী দ্বারা উৎপাদনের লক্ষ্য ঘোষিত হলেও বাংলাদেশ কপ-২৬-এর "বিশ্বব্যাপী কয়লা থেকে ক্লিন পাওয়ার ট্রানজিশন স্টেটমেন্ট"-এ স্বাক্ষর করেনি। সম্মেলন মনে করে যে, এই দলিলে বাংলাদেশের স্বাক্ষর করা উচিত ।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সম্মেলন কয়লা থেকে সরে আসা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানীর অধিক ব্যবহারের নীতিকে স্বাগত জানায় এবং মনে করে যে, এসব নীতির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং তা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে পারে। বিশেষত, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন উৎপাদনের একটি টেস্ট মডেল স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে সুনাম কুড়াতে পারে।

(গ) রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের ভূমিকার সঠিক সমন্বয়

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এখন তা রাষ্ট্রীয় খাতের ভূমিকার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিখাতের ভূমিকার বিভিন্ন অনুপাত লক্ষ করা যায়। তবে অনুপাতের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো কী নিয়ন্ত্রণ-কাঠামোর অধীনে ব্যক্তিখাতের বিকাশ সাধিত হচ্ছে। যদি এই বিকাশ একটি প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছতাসম্পন্ন, ঝুঁকিগ্রহণের সাথে মুনাফার সঠিক সম্পর্কের অধীনে অর্জিত হয়, তবে সেটা অর্থনীতির জন্য উপকারী হতে পারে। কিন্তু সেটা যদি কেবলই রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য এবং মুনাফার সাথে ঝুঁকি গ্রহণের সাথে সম্পর্কহীনভাবে গড়ে ওঠে, তবে তা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের বিকাশ মূলত উপর্যুক্ত দ্বিতীয় ধারাতে গড়ে উঠেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সে কারণেই সরকারকে বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানার বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার জন্য বিপুল পরিমাণ ভর্তুকী দিতে হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে ব্যক্তিখাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদনের আগে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের ভর্তুকী ও অন্যান্য বিভিন্ন আনুকূল্য নির্ভর না হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান পছন্দসই ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা অর্থনীতির জন্য মারাত্মক কুফল বয়ে আনবে। সংক্ষেপে, বিদ্যুৎখাতের রাজনীতিকরণ প্রতিরোধ করতে হবে।

এ বিষয়ে সম্মেলন লক্ষ করে যে, সাধারণত উন্নয়নের প্রথম ধাপে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারী খাতের ভূমিকা বেশী থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি পুঁজিঘন প্রক্রিয়া, এবং উন্নয়নের শুরুতে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের এত বড় পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের সক্ষমতা থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে নীতি-কাঠামো এবং তা প্রয়োগের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রয়োজন তা উন্নয়নের প্রথম ধাপে সরকারের থাকে না। সময়ে ব্যক্তিখাতের পুঁজি বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রেরও নীতি-কাঠামো এবং তা প্রয়োগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তখন ব্যক্তিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধি পেতে পারে। এক্ষেত্রে PSMP (2016/2018)-তে একটি বিপরীত প্রস্তাবনা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রথমেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে এবং পরে তা হ্রাস পেয়ে অত্যন্ত নীচু মাত্রায় পৌঁছাবে। কেন বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের একটি বিপরীত ধারা প্রযোজ্য হবে তার কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা PSMP (2016/2018)-তে পাওয়া যায় না। সম্মেলন মনে করে যে, বাংলাদেশে শক্তি উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকার পর্যালোচনা এবং উপযোগী নীতি-কাঠামো নির্ধারণ জরুরী হয়ে উঠেছে।

(ঘ) দেশীয় এবং বৈদেশিক সংস্থা এবং প্রভাবের সঠিক সমন্বয়

সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, বাংলাদেশের জ্বালানী খাতে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সংস্থা এবং প্রভাবকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রভাব দুই ধারায় অগ্রসর হয়েছে। একটি হলো জ্বালানীর উৎস হিসেবে। দ্বিতীয় হলো, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। আগে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় শতভাগ দেশীয় গ্যাস নির্ভর ছিল। কিন্তু চাহিদার তুলনায় দেশীয় গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ বিদেশ থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এল-এন-জি) আমদানি করছে। অন্যদিকে রামপাল, পায়রা প্রভৃতি বৃহদাকার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বিদেশ থেকে কয়লা আমদানির পরিমাণ বেড়েছে। ফলে এসব বৈদেশিক সূত্রের জ্বালানী সঠিকদামে এবং সঠিক কৌশলে আমদানি করা হচ্ছে কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, রামপালের জন্য অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে উন্নতমানের কয়লা আমদানির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভারত থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কয়লা আমদানি করা হচ্ছে। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির অধীনে অপেক্ষাকৃত স্বল্পদামে আমদানির পরিবর্তে স্পট মার্কেট থেকে উচ্চ দামে এল-এন-জি আমদানির অভিযোগ উঠেছে। সম্মেলন মনে করে এসব বিষয়ে সরকারকে আরও সংগতিপূর্ণ এবং স্বচ্ছতাভিত্তিক আচরণ প্রদর্শন করতে হবে।

বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সে বিষয়েও বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ধারণা যে, কিছু কিছু মহলের প্রভাবের কারণে সরকার দেশের গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের পরিবর্তে বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানির প্রতি বেশী নজর দিচ্ছে। এর একটি প্রমাণ হলো গত বিশ বছরে মাত্র বিশটির মতো কূপ খনন। তদুপরি আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকেও গ্যাস

উত্তোলনে তেমন সক্রিয়তা প্রদর্শিত হচ্ছে না। যেমন, ভোলাতে দু'টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও, সেগুলি থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে না কারণ গ্যাস সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ-লাইন বসানো হয়নি। একইভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে, ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পর বঙ্গোপসাগরে গ্যাস ও তেলের অনুসন্ধান ও উত্তোলন আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সে ধরণের কোনো তৎপরতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সম্মেলন মনে করে যে, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের প্রতি আরও গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে করে বাংলাদেশকে বৈদেশিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়। সম্মেলন সে ধারায় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিদেশী সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মেলন মনে করে যে, এক্ষেত্রেও সঠিক নিয়ন্ত্রণ-কাঠামোর উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। বিদেশী সংস্থার অংশগ্রহণ সরকারী আনুকূল্য এবং ভর্তুকি নির্ভর এবং ঝুঁকিহীন মুনাফা সম্বলিত হওয়া উচিত নয়। বরং, এই অংশগ্রহণ হতে হবে বাজার-ভিত্তিক, ভর্তুকীহীন, এবং "ঝুঁকির বিনিময়ে মুনাফা" নীতির অনুসারী। সম্মেলন সরকারকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

(ঙ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক আকার নিশ্চিতকরণ

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আকার বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের কিছু সুবিধা আছে। তাঁর মধ্যে যেমন, অর্থনীতির ভাষায়, "ইকনমিস অফ স্কেল," যার ফলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কম হয়। দ্বিতীয়ত, বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ চাহিদা সহজে পূরণ সুগম হয়। কিন্তু বৃহদাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কিছু অসুবিধাও আছে। তাঁর মধ্যে যেমন দীর্ঘ নির্মাণকাল। দ্বিতীয়ত, অধিকতর সঞ্চালন ব্যয় এবং সিস্টেম লস। তৃতীয়ত, অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে বৃহদাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ অনেকক্ষেত্রে সরকারী খাতে নির্মিত হয় যেখানে দুর্নীতি ও অপব্যবহারের সুযোগ বেশী থাকে। ফলে শেষাবধি ইউনিট-প্রতি উৎপাদন খরচ কম হয় না; বরং বাজারদামের চেয়ে বেশী হয় এবং এসব উৎপাদন কেন্দ্র লোকসানি প্রতিষ্ঠানে (তথা শ্বেত হস্তিতে) পরিণত হয়। কিন্তু বিরাট পরিমাণ লগ্নীকৃত পুঁজি (সাঙ্ক কস্ট) হিসেবে আটকে যাওয়ায় এগুলো পরিত্যাগ করা কঠিন হয় এবং তা ক্রমাগতভাবে সরকারের বাজেটের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিগত সময়কালে বাংলাদেশ বৃহদাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের দিকে ঝুঁকেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো সরকারের "পারচেজ গ্যারান্টি"র অধীনে নির্মিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এগুলোর অলস ক্যাপাসিটির জন্য সরকারকে বিরাট পরিমাণ ভর্তুকী দিতে হচ্ছে। পরিকল্পনাধীন এবং নির্মীয়মান বৃহদাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ বাস্তবায়িত হলে এই ভর্তুকীর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

সেজন্য সম্মেলন সরকারকে মাঝারি এবং ক্ষুদ্রাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকে উৎসাহিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। বস্তুত, সম্মেলন মনে করে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রাখার কথা ভাবা যেতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় বিদ্যুৎ চাহিদার নিরিখে, নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ এবং "ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন" নীতির ভিত্তিতে ব্যক্তি উদ্যোক্তারা প্রতিষ্ঠিত করবে, ফলে সরকারের বাজেটের উপর চাপ সৃষ্টি করবে না। ভোক্তাদের কাছাকাছি হওয়াতে এসব প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালন ব্যয় এবং সিস্টেম লস কম হবে।

বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বড় মাপের পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বৃহদাকারের পরিবর্তে সর্বাধুনিক চতুর্থ প্রজন্মের অধিকতর নিরাপদ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকৃতির রিয়েক্টর (Small

Modular Reactors) স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রসারের ক্ষেত্রে ও সরকার এসব বিকল্প বিবেচনায় নিতে পারে।

উপর্যুক্ত পরিলক্ষণের ভিত্তিতে সম্মেলন সরকারকে কেবল বৃহদাকার বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উৎসাহী না হয়ে বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রাকারের বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে একটি "সুষম আকার-বিতরণে"র (অপ্টিমাল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন) অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

(চ) বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, ও সঞ্চালন স্থাপনার সঠিক অবস্থান নিশ্চিতকরণ

বিদ্যুৎ উৎপাদন বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌগলিক অবস্থান নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিগত সময়কালে সরকার উপকূলবর্তী এলাকায় অনেকগুলো বৃহদাকার বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে এবং করার পরিকল্পনা করছে। যেহেতু এগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কয়লা নির্ভর, সেহেতু এগুলোকে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থাপনের একটা যুক্তি আছে। একইভাবে ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রও অনেক ক্ষেত্রে উপকূলে স্থাপিত হয়। অথচ রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের গভীর অভ্যন্তরে নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু উপকূলে অথবা দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার অনেক নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন, এগুলোর সঞ্চালন ব্যয় এবং সিস্টেম লস বেশী হয়। দূরবর্তী স্থানে নির্মিত হওয়ায় এগুলোর কর্মীদের জন্য পৃথক আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উপকূলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে সেখানকার স্পর্শকাতর পরিবেশের অপূরণযোগ্য ক্ষতি সাধন করে, যেমন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের উপকূল প্রায়শ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তা উপকূলে স্থাপিত বৃহদাকার বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা বাড়তি হুমকি সৃষ্টি করে।

উপর্যুক্ত পরিলক্ষণের ভিত্তিতে সম্মেলন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভৌগলিক অবস্থানের বিষয়ে উপকূল নির্ভরতা হ্রাস করে আরও সুষম স্থান-বিতরণ (অপ্টিমাল স্পেশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন)-র দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। সম্মেলন লক্ষ্য করে যে, এখন যেহেতু কয়লা-নির্ভরতা কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেহেতু বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ উপকূলে স্থাপনের যৌক্তিকতা হ্রাস পেয়েছে। গ্যাস-ভিত্তিক মাঝারী এবং ক্ষুদ্রাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের অভ্যন্তরে ভোক্তাদের নিকটে স্থাপন করা শ্রেয় হতে পারে। একইভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন; তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানেরও সাশ্রয় হবে। সম্মেলন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণের (decentralization of production and transmission) আহ্বান জানায়।

(ছ) উপযোগী বিতরণ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণ

সম্মেলন লক্ষ করে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি তা সঞ্চালন ও সাধারণভাবে জ্বালানী বিতরণ বিষয়ক নীতিমালা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেমন, সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশী এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ক্ষমতা ১০০ শতাংশ বেশী হওয়া দরকার। সুতরাং, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

এ বিষয়ে সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ সাধারণত বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে নিবদ্ধ হয়; ফলে প্রয়োজনীয় সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বহুলাংশে সরকারী খাতের উপর বর্তায়। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা

তার দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। তবে এই দায়িত্ব পালন করে সরকারকে ব্যক্তিখাতকে ভর্তুকী দেয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারী এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের নিকট হতে যৌক্তিক হারে সঞ্চালন ও বিতরণ বাবদ চার্জ আদায়ের মাধ্যমে সরকার এ বাবদ ভর্তুকী প্রদান পরিহার করতে পারে।

সম্মেলন লক্ষ করে যে, জ্বালানী বিতরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং বৈষম্য-পরিহার – উভয় দিকের প্রতিই নজর দেয়া প্রয়োজন। যেমন ইতিপূর্বে বাংলাদেশে গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য সিলিন্ডারের পরিবর্তে পাইপ-ভিত্তিক গ্যাস বিতরণের নীতি নেয়ার কারণে আঞ্চলিক, গ্রাম-শহর, এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে গ্যাসের প্রাপ্তি নিয়ে বৈষম্যের উদ্ভব ঘটেছিল। আজও বাংলাদেশ সে বৈষম্য পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানের নতুন পর্যায়ে জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে যাতে এ ধরণের বৈষম্যের উদ্ভব না ঘটে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সম্মেলন লক্ষ করে যে, আমদানিকৃত জ্বালানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে জ্বালানীর ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য এখন সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। কয়লা এবং গ্যাস ক্রয়ের উৎস, পদ্ধতি, এবং মূল্য দেশের স্বার্থ-রক্ষাকারী হচ্ছে কিনা তা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে যে, সাম্প্রতিককালে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির অধীনে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে কেনার পরিবর্তে স্পট মার্কেট থেকে চড়া মূল্যে গ্যাস ক্রয় করা হয়েছে এবং তাঁর ফলে সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে এবং বাংলাদেশে দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের সহযোগে সৃষ্ট মিশ্রিত গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মেলন এ ধরণের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কর্মকাণ্ড যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। একইভাবে কয়লা আমদানির ক্ষেত্রেও যাতে জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্যও সম্মেলন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানী এবং বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার পথ অনুসরণের জন্য সম্মেলন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। এই পথ অনুসারে দেশের অভ্যন্তরীণ উপকরণের দামও "সীমান্ত দাম" (বর্ডার প্রাইস)-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এই উত্তরণ এক লাফে করার চেষ্টা সমীচীন হবে না। তবে অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার স্বার্থে এটাকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং জনগণকে এই নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, যাতে তারা তা গ্রহণে সম্মতি দেয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদকদের নিকট উপকরণ সরবরাহ এবং তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে ভর্তুকী পরিহারের নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্মেলন লক্ষ করে যে, এই নীতি না গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদকদের, বিশেষত ব্যক্তি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদকদের, বিপুল পরিমাণ ভর্তুকী দিতে হচ্ছে। সকল ক্ষেত্রে উপকরণ ও উৎপাদনের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার দীর্ঘমেয়াদী নীতি অনুসরণের জন্য সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

(জ) জ্বালানী কৌশলের আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা

সম্মেলন মনে করে যে, জ্বালানী খাতকে আর্থিকভাবে স্থায়িত্বশীল হতে হবে। সে আলোকে ভর্তুকী দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের যে নীতি বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে, সে বিষয়ে সম্মেলন উদ্বেগ প্রকাশ করে। ব্যক্তিখাতের বিদ্যুৎ উৎপাদকদের সরকারী আনুকূল্য, অব্যাহত ভর্তুকী, এবং "ঝুঁকি-বিহীন মুনাফা" অর্জনের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে বাজার-ভিত্তিক, ভর্তুকীহীন, এবং "ঝুঁকি গ্রহণ এবং দক্ষতা প্রদর্শনের বিনিময়ে মুনাফা" অর্জনের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

সম্মেলন মনে করে যে, সরকারী খাতেও আর্থিক স্থায়িত্বশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নসাপেক্ষ প্রকল্প গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে মাত্র ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সম্মেলন উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্মেলন লক্ষ্য করে যে, অনেকের মতে অন্যান্য দেশে অনুরূপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আরও অনেক কম বাজেটে নির্মিত হয়েছে। কেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর বাজেট এত বেশী হলো তা ব্যাখ্যার জন্য সম্মেলন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, এত বড় বাজেটের একটি প্রকল্প তেমন কোন গণআলোচনা ছাড়াই সরকার গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। সম্মেলন লক্ষ করে যে, সরকার দ্বিতীয় একটি আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। সম্মেলন আশা করে যে, এটার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত গণআলোচনা, স্বচ্ছতা, এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সরকারী খাতে দুর্নীতি, অপচয়, ও অব্যবস্থাপনার হ্রাস জ্বালানী খাতের আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা অর্জনে সহায়ক হবে।

সম্মেলন লক্ষ করে যে, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের উপর আরও গুরুত্ব প্রদান বাংলাদেশের জ্বালানী খাতের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

সম্মেলন মনে করে যে, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে সরকা্রী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবর্ধমান লোকসানের অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্টদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এবং জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করে পরিবেশ বান্ধব, অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

(ঝ) জ্বালানী কৌশলের পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা এবং জ্বালানী, পানি, খাদ্য/ফসল ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

সম্মেলন লক্ষ করে যে, যদিও বৈশ্বিক "উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস" (উবগ) উদগীরণে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়, তবুও উবগ নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এ বিষয়ে সম্মেলন লক্ষ করে যে, বাংলাদেশ সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্যারিস চুক্তির অধীনে জাতিসংঘের নিকট যে "জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান" (ন্যাশনালি ডিটারমিন্ড কন্ট্রিবিউশন) পেশ করেছে তার সাথে বাস্তবে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সম্ভাব্য অর্জনের বিপুল ফারাক পরিদৃষ্ট হচ্ছে। সম্মেলন আশা করে যে, সরকার এই ফারাক পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সম্মেলন মনে করে যে, উবগ হ্রাসের পদক্ষেপ শুধুমাত্র বৈশ্বিক উবগ হ্রাসের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়। তা স্থানীয় পরিবেশের জন্যও সহায়ক হতে পারে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই কেন্দ্র বাতিলকরণ – অন্ততপক্ষে কয়লার পরিবর্তে গ্যাসে রূপান্তরের মাধ্যমে – বাংলাদেশ শুধু বৈশ্বিক পর্যায়ে উবগ হ্রাসে ভূমিকা পালন করতে পারে তাই নয়, বাংলাদেশের সুন্দরবন রক্ষাও নিশ্চিত করতে পারে। অন্যান্য কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। জ্বালানী ব্যবহারের পাশাপাশি পানি, খাদ্য/ফসল ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে এবং একটি খাতের বিকাশ করতে যেয়ে আরেকটি খাতের অযৌক্তিক ক্ষতি সাধন করা সঠিক হবে না।

(ঞ) জ্বালানী কৌশলের ঝুঁকি সহনশীল পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা

সম্মেলন লক্ষ করে যে, জ্বালানী সম্পর্কিত ঝুঁকি তিন ধরনের - পরিবেশগত, আর্থিক, এবং জীবন ও স্বাস্থ্যগত। বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানী নীতি এসব বিভিন্নমুখী ঝুঁকির প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করছে না বলে সম্মেলন উদ্বেগ প্রকাশ করে। রামপাল এবং অন্যান্য কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বরগুনার তালতলিতে পাওয়ার চায়নার নির্মাণাধীন বরিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা, বিষখালি ও বলেশ্বর এই তিন নদীর মোহনায় নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যথাযথ তদন্তপূর্বক তা উচ্ছেদ করার লিখিত নির্দেশ দেয়। সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের বিশ কিলোমিটারের মধ্যে উক্ত বিদ্যুৎ

কেন্দ্রটির অবস্থান হলেও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষার খসড়ায় সরকারকে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থান ও সম্ভাব্য দূষণের বিষয়ে কোন সুপারিশ উপস্থাপিত করা হয় নাই। পায়রা অঞ্চলে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ দেশের ইলিশ ও তরমুজ উৎপাদনের উপর এবং মাতারবাড়ী-মহেশখালী অঞ্চলের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ দেশের লবণ ও পর্যটন শিল্পের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সম্মেলন উদ্বেগের সাথে এই সমস্ত সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দিতে চায়।

ভর্তুকী-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং ব্যয়বহুল আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ আর্থিক ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। দেশের অভ্যন্তরে ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকায় আণবিক কেন্দ্রের নির্মাণ জীবন এবং স্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। দেশের জ্বালানী নীতিকে এসব বিভিন্নমুখী ঝুঁকি হ্রাসের প্রতি মনোযোগী করার জন্য সম্মেলন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কারণে বায়ুমানের সূচকের অবনতি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে জনস্বাস্থের ভবিষ্যৎ ঝুঁকি প্রশমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সম্মেলন দাবী জানায় ।

বায়ুদূষনকারী এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সমস্ত জ্বালানীর উৎস (যেমন, অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত ইট ভাটা, ফিটনেস-বিহীন গাড়ি, বাস, মোটর সাইকেল, ট্রলার, লঞ্চ, স্টিমার, উড়োজাহাজ, বিভিন্ন শিল্প এবং কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) চিহ্নিত করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে সেইসব উৎস বাতিল এবং অপসারণ করতে হবে।

জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ৭ম লক্ষ্য (Clean and Affordable Energy for All) পূরণে সহায়ক এমন নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে সামাজিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি, আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিবেশের উপর অভিঘাত সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মাত্রায় রাখার নিমিত্তে সকল প্রকল্পের জীবন-চক্র স্থায়িত্বশীলতা নিরূপন (Life Cycle Sustainability Assessment) করা প্রয়োজন।

(ট) জ্বালানী বিকাশে বর্জ্য ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, কোন জ্বালানীই সবদিক থেকে বিপদমুক্ত নয়। যেমন সৌর শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পর সৌর প্যানেলসমূহের যথাযথভাবে এবং নিরাপদ উপায়ে পরিত্যাগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এর ফলে ২০২০-২০৫০ সময়কালে শুধুমাত্র সৌর প্যানেল বর্জ্যের পরিমাণ ৭৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন হতে পারে। (বায়ু-শক্তি, ব্যাটারি স্টোরেজ ইউনিট, এবং কম জীবনকালসম্পন্ন অফ-গ্রিড বিদ্যুতের বর্জ্য এর মধ্যে গণনা করা হয় নি।) এটা বাংলাদেশের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জের পূর্বাভাস দেয়। সুতরাং, প্রথম থেকেই বাংলাদেশকে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার-সৃষ্ট বিভিন্ন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সম্মেলন আরও লক্ষ করে যে, ইলেকট্রনিক্স শিল্পের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহারও মানুষকে অনেক বিষাক্ত বর্জ্যের সংস্পর্শে আনতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে ক্যাডমিয়াম ও তামা-উপজাত বিভিন্ন পদার্থ, সীসা, হেক্সাফ্লুরোইথেন, পলিভিনাইল ফ্লোরাইড, টিন, লিথিয়াম এবং সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড, ইত্যাদি, যার উঁচু মাত্রা মানুষ এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একইভাবে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের যথাযথভাবে অপসারণ, স্থানান্তরকরণ, ও পরিত্যাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রচলিত জলবিদ্যুৎ (হাইড্রো পাওয়ার) – তথা নদীতে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন -- দীর্ঘমেয়াদী বিচারে নবায়নযোগ্য নয় কেননা এসব বাঁধের মেয়াদকাল সীমাবদ্ধ এবং তা অতিক্রান্ত হওয়ার পর নদীর গতিপথ ও অন্যান্য পরিবর্তনের কারণে তার পুনঃনির্মাণ সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ যেহেতু ২০৩০ সনের মধ্যে মধ্যে ৩০% এবং ২০৪০ সনের মধ্যে ৪০% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে, সেহেতু উন্নত দেশগুলির মতো বাংলাদেশেরও বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার-সৃষ্ট বর্জ্য ও বিপজ্জনক পদার্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহার, ও পরিত্যাগ নিশ্চিত করতে হবে।

শহর ও গ্রামের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনে বর্জ্য থেকে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উপজেলায় স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য-নিক্ষেপনাগার (Sanitary Landfill) গড়ে তুলতে হবে। এসব নিক্ষেপনাগারের চতুষ্পার্শে এমন প্রতিরক্ষামূলক আবরণ দিতে হবে যাতে আশাপাশের জমি এবং বায়ু দূষিত না হয় এবং বর্জ্যের দূষিত পানি পার্শ্ববর্তী ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানিতে না পৌঁছায়।

(ঠ) সনাতনী জ্বালানী বিষয়ে সঠিক কৌশল অবলম্বন

সনাতনী জ্বালানী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষত গ্রামীণ জীবনে, এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলন লক্ষ করে যে, এ বিষয়ে দু'ধরণের লক্ষ্য হতে পারে। একটি হলো যথাসম্ভব দ্রুত আধুনিক জ্বালানী দ্বারা সনাতনী জ্বালানীকে প্রতিস্থাপিত করায় সচেষ্ট হওয়া। দ্বিতীয় হলো সনাতনী জ্বালানীকে দ্রুত প্রতিস্থাপিত করার পরিবর্তে এর নেতিবাচক দিকসমূহ প্রশমন, যেমন উন্মুক্ত চুলার পরিবর্তে ধোঁয়া নিরোধক চুল্লীর ব্যবহার সম্প্রসারণ। সম্মেলন আশা করে যে, এসব বিকল্প বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণার ভিত্তিতে সঠিক লক্ষ্য এবং কর্মকৌশল গৃহীত হবে।

(ড) জ্বালানী এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস

সম্মেলন লক্ষ করে যে, অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আগের তুলনায় স্বাবলম্বী হলেও, নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে এখনো বহুলাংশে বৈদেশিক-নির্ভরতা দ্বারা আক্রান্ত। যেমন, সরকার দেশের জ্বালানী বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জাপানের টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানির দ্বারা। একইভাবে দেখা যায় যে, দেশের "বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" প্রণীত হয়েছে মূলত ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। অথচ ঘনিষ্ট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং সংস্থা দ্বারা প্রণীত পরিকল্পনা দেশের স্বার্থের জন্য সর্বাংশে অনুকূল হয় না। বরং অনেকক্ষেত্রেই তার ফল হয় প্রতিকূল। টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত PSMS 2016/2018 পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে বহু ভ্রান্ত এবং দেশের জন্য ক্ষতিকর প্রস্তাবনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, এতে চাহিদার সাথে সরবরাহের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করা হয় নি, যার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ অত্যধিক রিজার্ভ মার্জিনের সমস্যায় নিপতিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনা বাংলাদেশকে কয়লার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তৃতীয়ত, এই পরিকল্পনা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকার এক অদ্ভুত প্রক্ষেপণ পরিবেশন করেছে, যার যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার। চতুর্থত, এই পরিকল্পনা বাংলাদেশকে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুৎ আমদানির দিকে ঠেলে দিয়েছে। সব মিলিয়ে এই পরিকল্পনা জাতীয় স্বার্থের জন্য এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়নি।

উপর্যুক্ত পরিলক্ষণের আলোকে, সম্মেলন সরকারকে দেশের নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈদেশিক সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা থেকে বেড়িয়ে এসে জাতীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে জীবাশ্ম জ্বালানীর নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিস্কারের ক্ষেত্রে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সমস্ত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা প্রয়োজন। জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে, শিল্প-কারখানায়, যানবাহনে, কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে, এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতির দক্ষতা বাড়িয়ে কিভাবে জ্বালানী ক্ষেত্রে স্থায়িত্বশীলতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে একটি কার্যকর কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

সম্মেলন সাধারণভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে গবেষণা ও নীতি প্রণয়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারকে আহ্বান জানায়। এই লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক জ্বালানী গবেষণা কেন্দ্র (Center for Energy Excellence) গড়ে তোলা যেতে পারে। উপর্যুক্ত কেন্দ্র গড়ে তোলায় সরকারকে বাপা-বেন-এর সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাব করে। সম্মেলন আশা করে যে, সরকার এই প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

পরিশেষে সম্মেলন আশা করে যে, সরকার এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং দেশের জ্বালানী নীতিকে গণমুখী, অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং পরিবেশ বান্ধব করার দিকে এগিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অংশ
স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশসমূহ

সম্মেলনে জ্বালানী ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের অন্যান্য ইস্যু নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষত এসব ইস্যু সম্পর্কে বাপার শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এসব অভিজ্ঞতার আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সম্মেলন নিম্নলিখিত পরিলক্ষণ, সুপারিশ, এবং দাবীসমূহ উপস্থিত করে।

উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে

উপকূলজুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে যা সাম্প্রতিককালে সরকারের পেশকৃত দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষায় (Strategic Environmental Assessment) সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বাপা ইতোমধ্যেই (অক্টোবর ২০, ২০২১) CEGIS নামের সরকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করেছে। বাপা'র প্রস্তাবিত সুপারিশমালা আমলে নিয়ে নতুন করে একটি কৌশলগত সমীক্ষা তৈরি করতে হবে যেখানে সাধারণ মানুষ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ভুক্তভোগী মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অভিঘাতের ফলে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের কৃষি, সেচ, শিল্প-কারখানা, ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া, এবং সুন্দরবনসহ উপকূলীয় বনাঞ্চল অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। তাছাড়াও, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা, অকাল বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, এবং নদী ও উপকূলীয় ভাঙ্গন প্রবণতা বৃদ্ধি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ব্যহত করছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত অনন্যসাধারণ সার্বজনীন মুল্যমান সম্পন্ন (Outstanding Universal Value) বাস্তসংস্থানখ্যাত সুন্দরবন সুরক্ষার দাবী জানানো হচ্ছে এবং অন্যান্য উপকূলীয় বনাঞ্চল এবং মৎস সম্পদের অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃত উপকূলীয় পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করার দাবী জানানো হচ্ছে।

সুন্দরবন একটি বিশ্ব ঐতিহ্য এবং উপকূলীয় প্রাণ এবং সম্পদ রক্ষাকারী প্রাকৃতিক সুরক্ষা বলয়। সুন্দরবনের ক্ষতি হয় এমন যেকোন প্রকল্প থেকে দূরে থাকতে হবে এবং যেকোন মূল্যে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে।

বৃহত্তর সিলেট ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে

সিলেট এবং অন্যান্য অঞ্চলে পর্যটকদের মাধ্যমে যত্রতত্র বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার কার্যকর নীতিমালা এবং পদক্ষেপ নিতে হবে।

সিলেটে নির্বিচারে গাছ এবং টিলা কাটা বন্ধ করতে হবে।

হাওর অঞ্চলের জলাভূমি অন্যায়ভাবে দখল বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

হাওর অঞ্চলে কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদী এবং জলাভূমিতে নিক্ষেপণ বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে।

হাওরসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অবাধ দুর্নীতি রোধ করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

হবিগঞ্জের ঐতিহ্য ধংসকারী পরিবেশ ও মাটি দূষণ রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য যে বায়ু দূষণে হবিগঞ্জ দেশে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

তিস্তা অববাহিকার পরিবেশ সম্পর্কে

তিস্তা থেকে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত সড়ক ভেঙ্গে পরিবেশ-প্রতিবেশ বান্ধব উড়াল সড়ক করার দাবী জানানো হচ্ছে।

তিস্তা সেচ প্রকল্পের কার্যকারীতা পুনর্বিবেচনা করার দাবী জানানো হচ্ছে। সেচ প্রকল্পের পূর্বে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পানি প্রবাহ মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল এবং তিস্তা নদীর প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্রও সমৃদ্ধ ছিল বলে স্থানীয় জনগণ মনে করে। তিস্তা সেচ প্রকল্প সানিয়াজান, লাউতারা, কুনসাই, বুড়িতিস্তাসহ তিস্তা অববাহিকার কয়েকটি আন্তর্জাতিক নদীর ন্যায়সঙ্গত পানি প্রবাহের দাবিকে নস্যাত করে দিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষদের কাছে প্রতীয়মান হয়, তাই তিস্তার স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আরো বেশি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবী জানানো হচ্ছে।

তিস্তা সড়ক সেতু, শেখ হাসিনা সেতু এবং তিস্তা রেলওয়ে সেতু নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে নদীকে সংকুচিত করে ফেলেছে বিধায় নদীভাঙ্গন প্রবণতা বেড়েছে। নদীভাঙ্গন রোধকল্পে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানানো হচ্ছে।

তিস্তা পাড়ে গড়ে ওঠা সেনা কল্যাণ সংস্থাসহ নদীর জায়গায় অন্যান্য প্রকল্পের বৈধতা নিরূপণ করে অবৈধ দখল বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে।

চলন বিল এলাকার পরিবেশ সম্পর্কে

পরিবেশ বিধ্বংসী কার্যকলাপ এবং প্রকল্পের কারণে চলন বিলের ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১৮০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যাচ্ছে। পাখি, কচ্ছপ, কুমির, এবং শুশুক প্রজাতিও বিলুপ্তির পথে। চলন বিলে কৃষিজমির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের ফলেও চলন বিলের পানিপ্রাপ্যতা হ্রাস পেয়েছে। এই প্রবনতা রোধ করার লক্ষ্যে এখনই কার্যকর নীতিমালা এবং পদক্ষেপ নিতে হবে।

চলনবিল ধংসকারী অপরিকল্পিত রাস্তা, কালভার্ট, ও অন্যান্য স্থাপনা সরাতে হবে এবং বর্জ্য নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চলনবিলের নদীসমূহের সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার দাবী জানানো হচ্ছে। চলনবিলকে দখলমুক্ত করতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুকুর দখল বন্ধ করতে হবে এবং পুকুর সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

চলনবিলকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে সেখানে কারখানা স্থাপন বন্ধ করতে হবে, এবং মাছের চাষ বাড়াতে হবে। চলনবিলের উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বিতভাবে করতে হবে যাতে করে এই বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশগত গুণাবলী এবং বাস্তুতন্ত্র অক্ষুন্ন থাকে।

চলন বিলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

অন্যান্য বিষয়ে

অবৈধভাবে অপরিকল্পিত উপায়ে বালু উত্তোলনের ফলে নদী ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হচ্ছে। অসাধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের সদস্যদের সহযোগিতায় বালু ব্যবসায়ীরা তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। সম্মেলন এদের এই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বন্ধের জোর দাবী জানায়।

ঢাকাসহ ঘনবসতিপূর্ণ সমস্ত বড় বড় শহর ও নগরে গণমুখী যানবাহনের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তিগত গাড়ি এবং যানবাহন ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে যাতে করে যানযট ও বায়ু দূষনের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়।

সাধারণভাবে সম্মেলন পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টকারী উন্নয়ন কর্মকান্ড রোধ করার আহ্বান জানায়।

উপসংহার

২০২২ সনের বাপা-বেন সম্মেলনে "জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে"র বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয়েছে এবং তাঁর ভিত্তিতে যথেষ্ট সামগ্রিক পরিধির সুপারিশ উপরে পরিবেশিত হয়েছে। এখন যেটা প্রয়োজন তা হলো, এসব সুপারিশ জাতির নিকট উপস্থিত করা, এসবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গণসচেতনতা ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যে সম্মেলন পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন কেন্দ্র, এবং অন্যান্য মিডিয়া চ্যানেলের সহযোগিতা কামনা করছে। মিডিয়া বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সম্মেলন আশা করে যে, আগামীতেও তাদের এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে এবং এই সম্মেলনে গণমুখী, দেশের স্বার্থরক্ষাকারী, অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং পরিবেশ বান্ধব যেসব জ্বালানী নীতি গৃহীত হয়েছে তার প্রচারে এবং সরকার কর্তৃক তাঁর গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এবারের সম্মেলনে জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন বিষয়ক উপর্যুক্ত নীতি ও সুপারিশসমূহ জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবের প্রচার এবং তার বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সকল বাপা ও বেনের সদস্য এবং দেশের অন্যান্য পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন ও সংস্থার সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

সর্বোপরি, গৃহীত এই প্রস্তাবের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জ্বালানী খাতের গণমুখী, অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল ও পরিবেশ-বান্ধব বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্মেলন বাংলাদেশের আপামর জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

বাপা-বেন বার্ষিক সম্মেলন -২০২২
BAPA-BEN Annual Conference 2022

জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন
Energy, Climate Change and Sustainable Development

Join us at Facebook live LIVE /bapa.org.bd

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

Bangladesh Environment Network

www.ben-global.net
www.bapa.org.bd

bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd

9 /12, Block: D, Lalmatia
Dhaka - 1207